মহাপীঠ তারাপীঠ

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের কাছেই মন্দির নগরী মহাপীঠ তারাপীঠ । মা তারার মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত এই সিদ্ধপীঠ ।কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে কঠোর তপস্যায় আশাতীত ফল মেলে। সাধক কুলকুণ্ডলিনীকে জয় করতে পারে। কথিত আছে, একবার দেবীর মাতৃরূপ দর্শন চান বশিষ্ঠ মুনি। দেবীও নিরাশ করেননি। মাতৃরূপে দর্শন দেন দেবী। এখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন তারামায়ের ভক্ত বামাক্ষ্যাপা। ফলে এটি সিদ্ধ পীঠ হিসেবেও পরিচিত। তারাপীঠ মহাশ্মশানের শ্বেত শিমুল গাছের নিচে বসে সাধনা করেন সাধক বামদেব।কৌশিকী অমাবস্যায় তন্ত্র মতে এই রাতকে 'তারা রাত্রি'ও বলা হয়। এক বিশেষ মুহূর্তে স্বর্গ ও নরক দুইয়ের দরজা মুহূর্তের জন্য খোলে ও সাধক নিজের ইচ্ছা মতো ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক শক্তি সাধনার মধ্যে আত্মস্থ করেন ও সিদ্ধি লাভ করেন। কালীকে শুধুমাত্র মাতারা রূপে নয়, রাজরাজেশ্বরী, একজটা বা নীল সরস্বতী রূপেও পুজো করা হয় ।সমুদ্রমন্থনের সময়, বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন মহাদেব । তাঁকে স্তন্যপান করিয়ে বিষমুক্ত করেছিলেন তারা । তারাপীঠের তারা মা উগ্রতারা রূপেই পূজিত হন । এছাড়া এখানে তন্ত্র অনুসারে ব্রহ্মের সাধনা করা হয় দ্বিতীয় মহাবিদ্যায় তারার রূপ ।
পীঠস্থানগুলির মধ্যে তারাপীঠ একটি "সিদ্ধপীঠ", অর্থাৎ এখানে সাধনা করলে সাধক জ্ঞান, আনন্দ ও সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।কথিত আছে, তারাদেবী শ্মশানক্ষেত্রে ভীষণা বেশে বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন দিয়ে তাকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন।
মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবীমূর্তি সংস্থাপিত– শিবকে স্তন্যপানরতা তারার মূল প্রস্তরমূর্তিটি একটি 3-4 ফুট উঁচু ধাতব মূর্তির মধ্যে রাখা থাকে।দর্শনার্থীরা সাধারণত ধাতব মূর্তিটিই দর্শন করে থাকেন। এই মূর্তিটি তারা দেবীর ভীষণা চতুর্ভূজা, মুণ্ডমালাধারিণী এবং লোলজিহ্বা মূর্তি। এলোকেশী দেবীর মস্তকে রৌপ্যমুকুট থাকে। বহির্মূর্তিটি সাধারণট শাড়ি-জড়ানো অবস্থায় গাঁদা ফুলের মালায় ঢাকা অবস্থায় থাকে। মূর্তির মাথার উপরে থাকে একটি রূপোর ছাতা। মূর্তিটির কপালে সিঁদুর লেপা থাকে। পুরোহিতেরা সেই সিঁদুরের টিকা পরিয়ে দেন দর্শনার্থীদের। প্রতিকৃতি বিগ্রহের নিচে গোলকার বেদীতে দুটি রূপোর পাদপদ্ম থাকে। ভক্তরা নারকেল, কলা বা রেশমি শাড়ি দিয়ে দেবীর পূজা দেন।
তারাপীঠে শিব চন্দ্রচূড় হিসেবে পূজিত হন।মনিরচত্বর থেকে প্রায় তিন ফুট ওপরে পশ্চিমমুখী মন্দিরটি অবস্থিত। শহরের এক কোণে নদীর ধারে ঘন অরণ্য বেষ্টিত তারাপীঠ শ্মশানটি অবস্থিত। শ্মশানটি লোকালয় থেকে দূরে। তারাপীঠের শ্মশানটি শক্তিপীঠের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, তারা দেবীকে শ্মশানের অন্ধকারে বলিপ্রদত্ত ছাগের রক্ত পান করতে দেখা যায়।
তন্ত্রসাধকরা বিশ্বাস করেন নরকঙ্কাল ও শ্মশানক্ষেত্র তারা দেবীর বিশেষ প্রিয়। দেবীর যে সকল চিত্র আঁকা হয়ে থাকে, তাতে তাকে শ্মশানক্ষেত্রনিবাসিনী রূপেই দেখানো হয়। এই কারণে তন্ত্রসাধকেরা শ্মশানক্ষেত্রকেই তাদের সাধনস্থল হিসেবে বেছে নেন। অনেক সাধুই পাকাপাকিভাবে এখানে বাস করেন। শ্মশানে অনেক জটাধারী ভষ্মমাখা সাধু দেখা যায়। তারা বটবৃক্ষের তলায় নিজেদের কুটির সৃজন করে বাস করেন। এই সব কুটিরের মাটির দেওয়ালে তারা সিঁদুরমাখানো নরকপাল গ্রথিত করে রাখেন। কুটিরের দেওয়ালে শোভা পায় গাঁদার মালায় শোভিত হিন্দু দেবী ও তারাপীঠের সন্তদের ছবি। কুটিরের প্রবেশ পথের কাছে অনেক সময়েই মাল্যভূষিত ত্রিশূল ও নরকপাল রেখে দেওয়া হয়। তন্ত্রসাধনায় মানুষ ছাড়াও সাপ, বেজি,শিয়াল , হনুমান ও চন্ডালের করোটি প্রয়োজন হয়। এগুলির পাশাপাশি সাপের খোলসও কুটিরে রাখা থাকে। ভাল নরকপাল পূজা ও মদ্যপানের জন্য ব্যবহৃত হয়। কুমারী মেয়ে ও আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিদের মাথার খুলির অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা হয়।

নাগার্জুন / বশিষ্ঠ নামক এক ব্যক্তি এখানে তারাদেবীর তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অসফল হন। তখন তিনি বিষ্ণুর অবতার ভগবান বুদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভগবান বুদ্ধদেব তাকে বামমার্গে মদ্যমাংসাদি পঞ্চমকার সহ তারাদেবীর মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সাধনা করতে বলেন। এই সময় ভগবান বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে জানতে পারেন যে- শিবকে স্তন্যপানরতা তারাদেবী মন্দিরে প্রস্তরীভূত তারামূর্তি তারাপীঠ এ গুপ্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে । তখন ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশক্রমে নাগার্জুন / বশিষ্ঠ নামক এক ব্যক্তি তারাপীঠে এসে পঞ্চমকার সাধন পদ্ধতিতে 3 লক্ষ বার তারাবীজ ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন এবং তাতে তারাদেবী প্রীত হয়ে নাগার্জুন / বশিষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হন। নাগার্জুন / বশিষ্ঠ নামক এক ব্যক্তি দেবীকে অনুরোধ করেন যে তার গুরুদেব “ভগবান বুদ্ধ” যে □--- শিবকে স্তন্যপানরতা তারাদেবীকে ধ্যানে দেখেছিলেন, দেবী যেন সেই রূপেই তাকে দর্শন দেন। দেবী সেই রূপেই বশিষ্ঠকে দর্শন দেন এবং গুপ্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরীভূত মূর্তিটি প্রকট হয়। মা তারার সাক্ষাৎ দর্শনের পর থেকে নাগার্জুন / বশিষ্ঠ নামক এক ব্যক্তি “বশিষ্ঠমুনি” রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং সেই থেকে তারাপীঠ মন্দিরে শিবকে স্তন্যপানরতা মূর্তিতে দেবী তারা পূজিত হয়ে আসছেন ।রসায়নাচার্য নাগার্জুন ভগবান বুদ্ধদেব এর নিকট হইতে দেবী তারার সাধনপদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন বলে মনে করা হয়। পালযুগে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের সাথে বাংলায় বৌদ্ধ দেবী তারার সাধনা দশমহাবিদ্যার তারা সাধনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং রসায়নাচার্য নাগার্জুন দশমহাবিদ্যার - তারাবিদ্যায় সিদ্ধি লাভের পর বশিষ্ঠমুণিতে পরিণত হন।
(বলা বাহুল্য□-- যে বেদে / উপনিষদে/শ্রীরামচন্দ্র দেবের গুরুদেব যে ভগবান ব্রহ্ম বরিষ্ঠঋষি বশিষ্ঠ এরকথা লেখা আছে, সেই ব্রহ্ম বরিষ্ঠঋষি বশিষ্ঠ তারাপীঠে সাধনা করেননি । তারাপীঠে যে বশিষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্য বশিষ্ঠ মুনি”)
এই মন্দির ও শ্মশান একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই স্থানটির নামও এখানকার ঐতিহ্যবাহী তারা আরাধনার সঙ্গে যুক্ত। তারাপীঠ এখানকার "পাগলা সন্ন্যাসী" বামাক্ষ্যাপার জন্যও প্রসিদ্ধ। বামাক্ষেপা এই মন্দিরে পূজা করতেন এবং মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রে কৈলাসপতি বাবা নামে এক তান্ত্রিকের কাছে তন্ত্রসাধনা করতেন। বামাক্ষ্যাপা তারা দেবীর পূজাতেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মন্দিরের অদূরেই আটলা গ্রামে তাঁর আশ্রম অবস্থিত।

তারাপীঠ বীরভূম জেলার তারাপীঠ থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোটো গ্রাম। এটি দ্বারকা নদীর তীরে অবস্থিত। প্লাবন সমভূমির সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে এই তীর্থস্থান অবস্থিত। কিছুকাল আগেও বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মেছোপুকুরে ভরা গ্রামের থেকে তারাপীঠের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। বর্তমানে অবশ্য তীর্থমাহাত্ম্যের কারণে প্রচুর জনসমাগম হওয়ায় গ্রামটি ছোটোখাটো শহরের আকার নিয়েছে।

বামাক্ষ্যাপার সিদ্ধিলাভ
দীক্ষা গ্রহণের জন্য মায়ের অনুমতি প্রয়োজন। পাগল বামা তাঁর মায়ের নিকট থেকে অনুমতি লাভ করে তারাপীঠে ছুটে এসে তারা মাকে বললেন, "আমি এসেছি মা, মায়ের অনুমতি নিয়েই এসেছি। এবার তোর পদতলে স্থান দে মা। জয় তারা! জয় তারা! জয় মা তারা!"
মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কৈলাসপতি বাবা। দূর থেকে ভেসে আসছে " জয় তারা জয় মা তারা " ধ্বনি। তিনি বুঝতে

পারলেন কে আসছে। অনুমান মিথ্যা নয় কৈলাসপতি বাবার। একটু পরেই তিনি দেখতে পেলেন বামাচরণকে। বামাচরণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কৈলাসপতি বাবা। তারপর তিনি বামাচরণকে নিয়ে গেলেন আপন কুটিরের সামনে। কুঠিরের অভ্যন্তরে স্থাপিত মাতৃ- মূর্তির দিকে তাকিয়ে গভীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পরলেন বামাচরণ। চারদিকে এতো অন্ধকার, তাহলে কুটির মধ্যে এতো আলো কেন?

অপলক দৃষ্টিতে মাতৃ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন বামাক্ষ্যাপা। তিনি দেখলো, পলকে পলকে রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে মাতৃ মূর্তির। এ দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কেবল উপলব্ধি করতে হয় অন্তর দিয়ে। মায়ের পরিবর্তিত রূপগুলো স্বচক্ষে দেখতে পেলেন বামাচরণ। দেখলেন মায়ের দশটি রূপঃ "কালী, তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।"

নয়ন সার্থক হলো বামাচরণের। অব্যক্ত আনন্দে সারা দেহে তাঁর দুলতে লাগলো। চেতনা হয়ে পড়লো আচ্ছন্ন। তারপর এক সময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

কৈলাসপতি বাবার কথায় মোক্ষদানন্দ বেদ পাঠ করে শোনাতে লাগলেন বামাচরণকে। বামাচরণের দীক্ষা সম্পন্ন হলো। বামাচরণ এক এক করে শিখে নিলো ধর্ম, শাস্ত্র ও নীতি। ভৈরব-তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ শিক্ষাও শেষ হলো বামাচরণের। কৈলাসপতি বাবা এবার বামাচরণকে নিয়ে এলেন শ্বেত শিমুল বৃক্ষতলে পঞ্চমুন্ডির আসনে । বললেন "এ আসনে তুমি ধ্যানে বস। একাকী নির্ভয়ে জপ কর বীজমন্ত্র।" ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠমুনি, এই আসনে বসে তারা মন্ত্রে সাধনা করেন ও সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁরা মায়ের দর্শন করেন। তারপর আরও অনেকে সাধক এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তান্ত্রিক সাধক আনন্দ-নাথ,পণ্ডিত মোক্ষদানন্দ, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ আরও অনেকে এই পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেন।

কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে বামাচরণ ধ্যানে বসলেন। ধীরে ধীরে লোপ পেলো বিশ্ব-চরাচরের যাবতীয় অনুভূতি। দিন শেষে হয়ে নামে সন্ধ্যা। তারপর আসে রাত্রি। পৃথিবীতে কোথাও কোন কোলাহল নেই। যেন অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে পৃথিবীর। বামাচরণ তখন বাহ্যজ্ঞানহীন। জাগতিক সমস্ত সত্তা তার তখন বিলুপ্ত হয়েছে। অবশেষে দিনমণি উদয় হয়। দিগন্ত হয়ে ওঠে রঞ্জিত। এমন সময় বামাচরণ শুনতে পেলেন এক নারীকন্ঠের ডাক, "বামা! তুই সিদ্ধিলাভ করেছিস। পূর্ণ হয়েছে তোর প্রার্থনা। এই বৃক্ষমূলে আমি শিলাময়ীরূপে অধিষ্ঠিত রয়েছি। তোর সিদ্ধিলাভের প্রমাণস্বরূপ আগামী এক প্রহরের মধ্যে ধরাশায়ী হবে এই শ্বেত শিমুল বৃক্ষ।"

চমকে উঠলো বামাচরণ। সভয়ে বললেন "সেকি মা, এই শ্বেত শিমুল বৃক্ষ ধরাশায়ী হবে? "

হেসে উঠলো তারা-মা। বললে "হ্যাঁ ধরাশায়ী হবে। আর এখন থেকে এই বৃক্ষের বদলে মহাজ্যোতিঃরূপে আমি স্বয়ং এখানে বিরাজ করবো। তোর সিদ্ধিলাভের পর মাত্র তিন লক্ষবার মন্ত্রজপ করে এই কলিযুগে এখানে সিদ্ধিলাভ করবে একাদশ সহস্র সাধক।"

তারা-মায়ের কথা কি মিথ্যা হতে পারে? ঠিক এক প্রহর মধ্যে ধরাশায়ী হলো শ্বেত শিমুল বৃক্ষ। আর তৎক্ষণাৎ সেই স্থান অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সেই অত্যুজ্জ্বল আলোয় প্রকাশিত হলো এক নীলবর্ণ নারীমূর্তি। সেই মূর্তির বামপদ শবের উপর স্থাপিত, বামহস্তে নীলপদ্ম ও কপাল-পাত্র, ডান-হস্তে খড়্গ। দেবীর পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, গলায় মহাশঙ্খমালা, মস্তকে পিঙ্গল বর্ণের জটাজাল, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। বামাচরণ চিনতে পারলো এই মূর্তিকে। ইনিই তাঁর আরাধ্যা দেবী- তারা-মা।

তারা–মা সস্নেহে দু'হাত প্রসারিত করলেন। বুকে টেনে নিলেন পাগল সন্তান বামাচরণকে। আত্মার সংগে পরমাত্মার সংযোগ স্থাপিত হলো। জগতে বামাচরণ সুপরিচিত হলেন 'বামাক্ষ্যাপা' নামে।

১২৭৪ বঙ্গাব্দের কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্বেত-শিমূল বৃক্ষের নীচে তারা মায়ের প্রিয় পুত্র সাধক বামদেব পরম সিদ্ধিলাভ করেন এবং তারা মা বামাচরণকে চিরদিনের জন্য স্থান দিলেন তাঁর শ্রীচরণকমলে। শিষ্যের সিদ্ধিলাভে খুশী হলেন গুরু কৈলাসপতি বাবা।

জয় তারা জয় বাম। জয় জয় তারা জয় জয় বাম।

****

ভাদ্র মাসের আমাবস্যা কে কৌশিকী আমাবস্যা বলা হয়ে থাকে । এদিন তন্ত্র ক্রিয়ার বিশেষ সফলতার জন্য তিথির মাহাত্ম্য এতটাই বেশি যে হাজার হাজার ভক্ত তারাপীঠ ছুটে যান ।

মা তারা হলেন দশ মহাবিদ্যার মধ্যে দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। কৌশিকী হল মা তারারই বিশেষ রূপ। রং কালো হওয়ার জন্য ভোলেনাথ নাম দেন কৌশিকী। কথিত আছে কৌশিকী অমাবস্যার দিনে তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্বেত শিমুল বৃক্ষের তলায় সাধক বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই বিশেষভাবে পালিত হয় এই অমাবস্যা তিথি।

বলা হয় এই অমাবস্যা তিথির একটা বিশেষ সময়ে স্বর্গ এবং নরকের উভয় দিকের দ্বার খুলে যায়। সাধক যেদিকে যেতে চান মহা শক্তি তাকে সেদিকেই আকর্ষিত করে। এই অমাবস্যার রাত্রি খুব বিশেষ, তন্ত্র ক্রিয়া করলে সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং এই দিনের তন্ত্র ক্রিয়া বিশেষ শক্তিশালী। তাই এদিন তারাপীঠ মহাশ্মশানে খুবই ভিড় থাকে, সাধনার শ্রেষ্ঠ সময় হল ভাদ্র মাসের কৌশিকী আমাবস্যার এই বিশেষ রাত্রি।এই বিশেষ তিথির সঙ্গে তারাপীঠের এক গভীর যোগ রয়েছে। কারণ, এদিন তন্ত্র সাধনা, যোগ্য বা মনের কোনও ইচ্ছা পূরণ করার তিথি।

Published on: Mar, 21 2023 11:28